বাঙালির খাবারের ১১ পদ

ভোজনের ব্যাপারে বাঙালি বেশ খুঁতখুঁতে। টক, ঝাল, মিষ্টি কোনোটাতেই অরুচি নেই। কিন্তু স্বাদ-গন্ধের বেলায় এক চুল ছাড় দিতে নারাজ। বাংলা ভাষাভাষীদের খাদ্য তালিকাও বেশ দীর্ঘ। ভাত থেকে শুরু কতো না পদের সমাহার সেখানে। এসব নিয়ে ঈশ্বর গুপ্ত তো কবিতা লিখে গেছেন: *ভাত মাছ খেয়ে বাঁচে বাঙালি সকল/ ধানে ভরা জমি তাই মাছ ভরা জল*। মাছে ভাতে বাঙালির পাতে এমন কিছু পদের আধিপত্য আছে যেগুলোর উৎপত্তি এদেশে না। যুগে যুগে ভারতবর্ষে আগমন ঘটেছে একাধিক দখলদারদের। এ মাটি থেকে তারা নিয়েছেন অনেক। তবে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে কিছু রেখেও গেছে। বাঙালির পাতের ১১ পদও সেসবের অন্তর্ভুক্ত। চলুন জেনে নেওয়া যাক সে সম্পর্কে।

শুক্তো

বাঙালির ১১ পদের এক পদ হচ্ছে শুক্তো। অনেকে একে শুক্তোনি বলে থাকেন। স্বাদে তিক্ত শুক্তো সাধারণত ভোজনের শুরুতে মুখশুদ্ধিতে খাওয়া হয়। তবে স্বাদে তিতকুটে কিছু পছন্দ না করলেও শুক্তোর ব্যাপারটা উল্টো। বলা যায় অনেকটা আগ্রহভরেই এই খাবার খেয়ে থাকি আমরা। ফলে ঘরের খাবার বা অতিথি আপ্যায়নে শুক্তো ছাড়া বাঙালির চলেই না। শুক্তোর উৎপত্তি কোথায় প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। শুক্তোর উৎপত্তির ভারতে কেরালা রাজ্যে। পরে তা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিশেষ সমাদর পায় বাঙালিদের কাছে। এর দুটি উদাহরণ দেওয়া যাক। পদ্মপুরাণে বেহুলার বিয়ের খাবারে নিরামিষের তালিকায় শুক্তোর উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া ভরতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে বাইশ রকম নিরামিষের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে এই শুক্তোর নাম। তবে শুক্তোর উৎপত্তি নিয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন কেউ কেউ। তাদের মতে এটি প্রাচীনকালে পর্তুগিজদের প্রতিদিনের খাবারের একটি ছিল।

জিলাপি

জিলাপি বা জিলিপি এক মজার মিষ্টি খাবার। ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন দেশে যথা ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, বাংলাদেশে এই মিষ্টান্নটি জনপ্রিয়। বাংলাদেশ বা পশ্চিমবঙ্গের এমন কোনো এলাকা নেই যেখানে জিলাপি পাওয়া যায় না। এর চাহিদাও প্রচুর। কখন কার হাত দিয়ে এসেছে এই মিষ্টি সে সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। মধ্যপ্রাচ্যের খাদ্য গবেষক ক্লডিয়া রডেনের দাবী অনুযায়ী ত্রয়োদশ শতকেরও আগে উৎপত্তি ঘটেছিল এই জিলাপির। বিভিন্ন দেশে এটি বিভিন্ন নামে পরিচিত। ইরানে জিলাপি পরিচিত জালাবিয়া নামে। এছাড়া মালদ্বীপে জিলিপি, তিউনিশিয়া, লিবিয়া আর আলজেরিয়াতে জিলিবিয়া ডাকা হয়। নেপালে এর নাম জেলি। এবার জেনে নেই ইরানি এই মিষ্টির ভারত আগমনের গল্প। সে মধ্যযুগের কথা। সে সময় ভারত আক্রান্ত হয়েছিল তুর্কিদের দ্বারা। তারাই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল জিলাপি। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের খুব প্রিয় ছিল এই পদ। জিলাপিতে মুগ্ধ সম্রাট নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়ে এই মিষ্টির নাম দিয়েছিলেন জাহাঙ্গীরা।

বিরিয়ানি

বিরিয়ানি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো, বিশেষ করে ভারত, বাংলাদেশ, মিয়ানমার প্রভৃতি দেশে প্রচলিত এক বিশেষ খাবার যা সুগন্ধি চাল, ঘি, গরম মশলা এবং মাংস মিশিয়ে রান্না করা হয়। এটি ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের মাধ্যমে উৎপত্তি লাভ করে। এটি সাধারণত বিশেষ অনুষ্ঠানে অতিথি আপ্যায়নে পরিবেশিত হয়। শুধু বাংলাদেশ নয় উপমহাদেশ জুড়ে এ খাবারের সমাদরের কথা সবার জানা। বিরিয়ানি শব্দ এসেছে ফারসি বিরিয়ান শব্দ থেকে। এর অর্থ রান্নার আগে ভেজে নেওয়া। অর্থের সঙ্গে কাজেরও মিল রয়েছে। কেননা রান্নার আগে বিরিয়ানির চাল ঘিয়ে ভেজে নেওয়া হয়। ভারতবর্ষে বিরিয়ানির আগমন মোগলদের মাধ্যমে। তাই বলে যে এর আগে উপমহাদেশের মানুষজন বিরিয়ানি চিনত না এমন না। বিরিয়ানির সঙ্গে ভারতবর্ষের মানুষের প্রায় ৪০০ বছরের সখ্যতা। কাচ্চি বিরিয়ানি নিয়েও আলাদা গল্প আছে। খাদ্য গবেষক ও ঐতিহাসিকদের মতে দইয়ে রেখে দেওয়া মাংস ও মশলা ভাত মিশে নতুন পদটির উৎপত্তি হয় যা পরে কাচ্চি বিরিয়ানি নামে পরিচিতি পায়। এছাড়া আরও অনেক রকমের বিরিয়ানি আছে।

শিঙাড়া

ভাজাপোড়ার মধ্যে অন্যতম একটি খাবার শিঙাড়া। শুধু বাংলাদেশ না, ভারত পাকিস্তানেও সমানভাবে জনপ্রিয়। তবে উপমহাদেশে জনপ্রিয় হলেও উৎপত্তি কিন্তু এর আশেপাশে না। এর উৎপত্তি মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ায়। পরে তা ছড়িয়ে পড়ে আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়াসহ ধীরে ধীরে অন্যান্য জায়গায়। ভারতে শিঙাড়ার আবির্ভাব ঘটে মধ্য এশিয়ায় তুর্কি রাজবংশের আগ্রাসনের পর। ইতিহাসবিদদের মতে, ভারতে ২ হাজার বছর আগে শিঙাড়ার আবির্ভাব। ফার্সি কবি ইসহাক আল-মাওসিলির নবম শতাব্দীর একটি কবিতায় শিঙাড়ার প্রশংসনীয় পাওয়া যায়। আমির খুসরো (১২৫৩-১৩২৫), একজন আলেম এবং দিল্লি সুলতানিয়ের রাজকবি, ১৩০০ খ্রিষ্টাব্দে লিখেছিলেন যে -রাজকুমারগণ ও আভিজাত্যরা 'মাংস, ঘি, পেঁয়াজ ইত্যাদিতে প্রস্তুত শিঙাড়া উপভোগ করেন।' বর্তমানে শিঙারা ভারত, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের খুবই জনপ্রিয় নাস্তা। বিশেষ করে বাঙালিদের কাছে।

খিচুড়ি

গ্রিক দূত সেলুকাস উল্লেখ করেছেন ভারতীয় উপমহাদেশে চালের সাথে ডাল মেশানো খাবার খুবই জনপ্রিয় ছিল। মরোক্কোর বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা কিশরির কথা উল্লেখ করেছেন যা চাল এবং মুগ ডাল দিয়ে প্রস্তুত করা হতো। ১৫ শতকে ভারতীয় উপমহাদেশে ঘুরতে আসা রাশিয়ান পর্যটক আফনাসিই নিকতিন খিচুড়ির কথা তার লেখায় বর্ণনা করেছেন। চাণক্যের লেখায় মৌর্যযুগে চন্দ্রগুপ্তের শাসনামলে চাল, ডালের মিশ্রণে তৈরি খিচুড়ির উল্লেখ পাওয়া যায়। গ্রিক পরিব্রাজক মেগাস্থিনিসের লেখাতেও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের রাজসভার রান্নাঘরে খিচুড়ির কথা পাওয়া যায়। সপ্তদশ শতকে ফরাসি পরিব্রাজক তাভেরনিয়ের লিখেছেন, সে সময় ভারতের প্রায় সব বাড়িতেই খিচুড়ি খাওয়ার রেওয়াজ ছিল। আকবরের মন্ত্রী ও ঐতিহাসিক আবুল ফজল রাজকীয় রান্নাঘরে বিভিন্ন ধরনের খিচুড়ি রান্নার কথা লিখেছেন। আইন-ই-আকবরিতে বিভিন্ন প্রকার খিচুড়ির প্রস্তুতপ্রণালী পাওয়া যায়। সেখানে আকবর এবং বীরবলের খিচুড়ি রান্নার একটি গল্প উল্লেখ করা হয়েছে। মুঘল রান্নাঘরে জাহাঙ্গীরের প্রিয় বিশেষ ধরনের খিচুড়ি তৈরি করা হতো পেস্তা, কিসমিস দিয়ে। সেই খিচুড়িকে জাহাঙ্গীর নাম দিয়েছিলেন 'লাজিজান'। সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্রিয় 'আলমগিরি খিচড়ি'র কথাও জানা যায়। এই খিচড়িতে চাল, ডালের সঙ্গে মেশানো হতো বিভিন্ন প্রকার মাছ ও ডিম।

চা

কথায় আছে, চা-পাগল বাঙালি। ধোঁয়া ওঠা এক কাপ চা মুহূর্তে বাঙালির অবসর সময় অথবা আড্ডা জমিয়ে তুলতে পারে। আবার কাজের চাপ লাঘবেও এর ভূমিকা রয়েছে। বাঙালির অতি প্রিয় এই চায়ের উৎপত্তি কিন্তু সুদূর চীন দেশে। জানা যায়, চা চাষে চীনের একচেটিয়া আধিপত্যে ভাগ বসানোর উদ্দেশ্যেই ভারতে চা চাষ শুরু করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ১৬০০ শতাব্দীতে ডাচ ব্যবসায়ীরা ফুজিয়ান অঞ্চল থেকে চা নিয়ে পাড়ি দেন বিদেশে। এবং তার পরেই ধীরে ধীরে চা ছড়িয়ে পড়ে সারা পৃথিবীতে। চা মৌসুমী অঞ্চলের পার্বত্য ও উচ্চভূমির ফসল। একপ্রকার চিরহরিৎ বৃক্ষের পাতা শুকিয়ে চা প্রস্তুত করা হয়। চীন দেশই চায়ের আদি জন্মভূমি। বর্তমানে এটি বিশ্বের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পানীয়রূপে গণ্য করা হয়। ১৬৫০ খ্রিষ্টাব্দে চীনে বাণিজ্যিকভাবে চায়ের উৎপাদন শুরু হয়। আর ভারতবর্ষে এর চাষ শুরু হয় ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে। ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশরা সিলেটে সর্বপ্রথম চায়ের গাছ খুঁজে পায়। এরপর ১৮৫৭ সালে সিলেটের মালনীছড়ায় শুরু হয় বাণিজ্যিক চা-চাষ।এক গবেষণায় দেখা গেছে, ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দে সমগ্র বিশ্বে ৩৮,০০,০০০ টন চা পাতা উৎপাদিত হয়েছে।

ভিন্দালু

গোয়ান ভিন্দালু বা ভিন্দালহো হলো একটি ভারতীয় তরকারিজাতীয় খাবার, যার উৎপত্তি মূলত গোয়া থেকে। পর্তুগিজ খাবার কার্নে দে ভিনহা ডি-আলহোসের উপর ভিত্তি করে এই খাবারটি উদ্ভব হয়েছে। এটি বিশ্বব্যাপী

ব্রিটিশ ভারতীয় প্রণালিতে কারি হাউস এবং রেস্তোরাঁর প্রধান খাবার হিসাবে পরিচিত। ভিন্দালুর ব্রিটিশ ভারতীয় সংস্করণে মাংসকে ভিনেগার, চিনি, তাজা আদা এবং মশলা দিয়ে মেরিনেট করা হয়, তারপর আরও মশলা দিয়ে রান্না করা হয়। গোয়ার রেস্তোরাঁগুলি ঐতিহ্যবাহী গোয়ান রন্ধনপ্রণালী অনুসারে শুয়োরের মাংস দিয়ে ভিন্ডলহো প্রস্তুত করে। কোচি, কেরালার খ্রিষ্টানরা শুয়োরের মাংস বা গরুর মাংস ব্যবহার করে এটি প্রস্তুত করে। ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান এবং সমুদ্রগামী লাইনারগুলিতে গোয়ান বাবুর্চিদের হাত দিয়ে এই রান্না জনপ্রিয় হয়েছিল। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের রেস্তোরাঁগুলি মুরগি, ছাগল বা ভেড়ার মাংস এমনকি সামুদ্রিক খাবারের সাথে ভিনডালহো প্রস্তুত করা হয় এবং এই মাংসগুলিকে কখনও কখনও চৌকো করে কাটা আলু দিয়ে মেশানো হয় যাতে খরচ কম হয়। যদিও আলু (আলু) শব্দের অর্থ হিন্দিতে আলু, ঐতিহ্যবাহী গোয়ান ভিন্দালহোতে কোনো আলু ব্যবহার হয় না। ভিন্দালু নামটি একটি পর্তুগিজ শব্দগুচ্ছের অপভ্রংশ যার কোনো হিন্দি ব্যুৎপত্তি নেই।

গুলাবজামুন

বলা হয় যে, মধ্য এশীয় তুর্কি আক্রমণকারীদের দৌলতে একটি প্যানকেক-জাতীয় খাদ্যবস্তু থেকে প্রথম গুলাবজামুন মধ্যযুগীয় ভারতে তৈরি করা হয়েছিল। অন্য একটি সূত্র এটা দাবি করে যে, গুলাবজামুন আসলে মুঘল সম্রাট শাহজাহানের ব্যক্তিগত রাধুনির দ্বারা আকস্মিকভাবে তৈরি হয়েছিল। আক্ষরিক অর্থে গুলাবজামুন একটি পার্সিয়ান শব্দ থেকে এসেছে। 'গুল' মানে ফুল এবং 'আব' মানে জল। সেই অর্থে একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিকের মতে, 'লাকুমত আল-কাদি' এবং 'গুলাবজামুন' দুটোই একটি পার্সিয়ান খাদ্যবস্তু থেকে তৈরি হয়েছে।

চিকেন টিক্কা মাসালা

ঝাল ঝাল চিকেন টিক্কা মাসালার নাম শুনলেই জিভে জল আসে। এই পদের উৎপত্তিস্থল স্কটল্যান্ড। তবে এর সাথে দ্বিমত পোষণকারীর সংখ্যাও কম না। তারা পাঞ্জাবসহ বিভিন্ন স্থানকে এর উৎপত্তিস্থল বলে দাবি করেন। খাবারটি বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়। এর পেছনেও রয়েছে ভারতীয়দের হাত। ব্রিটেনে বসবাসকারী ভারতীয় রন্ধন শিল্পীদের দ্বারা পরিচিতি পায় এবং যুক্তরাজ্যের চাহিদাসম্পন্ন খাবারগুলোর একটি হয়ে পড়ে।

রাজমা

এটি মূলত নেপাল এবং উত্তর ভারতের একটি জনপ্রিয় খাবার। এই 'রাজমা ডাল' যেমন মেক্সিকোয় জনপ্রিয়ভাবে উৎপাদিত হয়, ঠিক তেমনভাবে 'মোলে সস' দিয়ে এই ডাল রান্নার চলও মেক্সিকোয় বিখ্যাত। রাজমাকে ইংরেজিতে বলে কিডনি বিনস। আমরা যাকে চিনি রাজমা হিসেবে। পার্শবর্তী দেশ ভারতে এটি বেশ জনপ্রিয় একটি খাবার। সাদা, ক্রিম, কালো, লাল, বেগুনি, স্পটেড, স্ট্রাইপড এবং মোটলড নানা রকম কিডনি বিনস পাওয়া যায়। মেক্সিকো থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে লাল কিডনি মটরশুঁটি আনার পর এই খাবারের বিকাশ ঘটে। রাজমা চাওয়াল কিডনি মটরশুঁটি সিদ্ধ ভাতের সাথে পরিবেশন করা হয়। রাজমা কার্বোহাইড্রেটে ভরপুর। তবে এই কার্বোহাইড্রেট মোটেই ক্ষতিকারক নয়। এই কার্বোহাইড্রেট হজমে বিলম্ব ঘটায়, যার ফলে রক্তপ্রবাহে শর্করাও নির্গত হয় অল্প। কিডনি বিন কম গ্লাইসেমিক ইনডেক্স সম্পন্ন হওয়ায় এটি ডায়াবেটিসের রোগীর জন্য আদর্শ খাদ্য।

নান

নান এক ধরনের ওভেনে পাকানো রুটি যা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর একটি জনপ্রিয় খাদ্য। মূলত পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সমান রুটির সাধারণ নাম হলো নান। এই পদের উৎপত্তি কিন্তু বাংলাদেশে না। এর উদ্ভব মূলত মধ্যপ্রাচ্যের দিকে। পরে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে এবং জনপ্রিয়তা লাভ করে। অনেকে আবার ভিন্নমত পোষণ করেন। তাদের কথানুযায়ী ২৫০০ বছরের পুরনো এই পদ। যার উৎপত্তি ঘটেছিল পার্সিয়ান ও মোগলদের হাত ধরে।